আমরা তিনজন

- বুদ্ধদেব বসু

তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম ঃ আমি, আর অসিত, আর হিতাংশু; ঢাকায় পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে ঢাকা সকাল।

এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিল তারা-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার পেনশন পাওয়া সাব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড় রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থেই তাই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা লম্বা চোর-কাঁটা ছাওয়া মাঠ ভরে গেল, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হলো না। আমরা এসেছিলাম কিছু পারে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচেছ। একটা সময় ছিল, যখন ওই তিনখানাই বাড়ি ছিল পুরানা পল্টনে, বাকিটা ছিল এবড়োথেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হলদে-হলদে রঙের ব্যাঙ আর নধর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ডাকা দুপুর!

আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সব সময়-যতটা এবং যতক্ষণ থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকত, 'বিকাশ! বিকাশ!' আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম, দেখতাম অসিত সাইকেলে বসে আছে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে এমন লম্বা ও কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধরে যেত আমার। হিতাংশুকে ডাকতে হতো না, দাঁড়িয়ে থাকতে তাদের বাগানের ছোট ফটকের ধারে, কি বসে থাকত বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে চেপে চলে যেত পাকা সড়ক ধরে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে; আমি আর হিতাংশু ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধরে, হাওয়ায় গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে!

বিকেলে দুটি সাইকেলে চড়ে প্রায়ই শহরে যেতাম, কোনোদিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কটলেট খেতে, কোনোদিন শহরে একটি মাত্র সিনেমায়, কোনোদিন চিনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হলো না- চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি ওটা, কিন্তু ওই দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক; কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হয়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের সোফায় শুয়ে বসে, ছোট ছোট তারা ফুটছে আকাশে, চোর-কাঁটা ফুটছে কাপড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লন্ঠনটা মিটমিট করছে দূর থেকে। এ সময়টা হিতাংশু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকত না- আটটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হত বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার উপর ছিল না, অসিতের উপরেও না, দুজনে বসে থাকতাম অন্ধকারে, ফেরার সম্য আস্তে আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফেলে উঠে এসে চুপি চুপি দু-একটা কথা বলেই সে চলে যেত।

আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম, আবার তিনজন একসঙ্গে অন্য একজনের প্রেমে পড়লাম, সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে উনিশ-শো সাতাশ সনে।

নাম তার অন্তরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন, কিন্তু ঢাকার মতো কিছুই তো তাদের নয়, মেয়ের নামই বা হবে কেন। ভদ্রলোক বাড়িতেও প্যাণ্ট পরে থাকেন, আর ভদ্রমহিলা এমন সাজেন যে পিছন থেকে হঠাৎ তাকে তার মেয়ে বলে ভুল হয়-আর তার মেয়ে, তাদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলব। সে সকালে বাগানে, বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় বসে থাকে বই কোলে নিয়ে, বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁসেই, সবসময় দেখা যায় তাকে, মাঝে মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ;- সেই ঢাকায় সুদূর সাতাশ সনে, কোনো একটি মেয়েকে চোখে দেখা যখন সহজ ছিল না, যখন বন্ধ গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিল আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন এই যে মেয়ে, যাকে আমরা দেখতে পাই এক একদনি এক এক রঙের শাড়িতে, আর তার উপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়ব না এমন সাধ্য কী আমাদের। নামটা কিন্তু বের করেছিলাম আমি। রোজ সবই করে পাউরুটি রাখতে হয় আমাকে, একদিন রুটিওলার খাতায় নতুন একটা নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কা ার করে লেখা ঃ 'অন্তর দে'। একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে, খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরি করলাম, তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, নাম কি অন্তরা?

কার-কিন্তু তক্ষুণি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বলল, বোধ হয়। অসিত বলল, সুন্দর নাম।

ডাকে তরু বলে।

তরু! এই ঢাকা শহরেই দু-তিনশো অন্তত তরু আছে, কিন্তু সে মুহূর্তে আমার মনে হলো এবং আমি বুঝলাম অসিতেরও মনে হলো যে, সমস্ত বাংলা ভাষায় তরুর মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলাই চাই, কেননা যাকে নিয়ে বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, তাদেরই বাড়ির একতলায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চেয়ে বেশি না জানলে ওর মান থাকে না। তাই ও নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বলল, 'অন্তরা থেকে তরু-এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

ভালো না কেন, খুব ভালো। গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভেতরটা কেমন দমে গেল।

'আমি হলে অন্তরাই ডাকতাম।'

কী সাহস! কী দুঃসাহস! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধরে! ইস! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হয়ে উঠল, বেশ চোখাচোখা কয়েকটা কথা মনে মনে গোছাচ্ছি, ফস করে অসিত বলে উঠল, আমিও তাই।

বিশ্বাসঘাতক!

এ রকম ছোট ছোট ঝগড়া হতো আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত হতে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিল তাতেই বেশি মানিয়েছিল, না কালকের বেগুনি রঙেরটায়;

সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়ে ছিল তখন পিঠের উপর বেণী দুলছিল, না চুল খোলা ছিল, বিকেলে বারান্দায় বসে কোলের উপর কাগজ রেখে চিঠি লিখছিল, না আঁক কষছিল-এমনি সব বিষয় নিয়ে

চেঁচামেচি করে আমরা গলা ফাটাতুম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হতো যে কথা নিয়ে সেটা একটু অদ্ভুত ঃ ওর মুখের সঙ্গে মোনালিসার মিল কি খুব বেশি, না অল্প একটু, না কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনালিসার ছাপা-ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরোল কথাটা-ওর মুখ অনেকটা মোনালিসার মতো। তারপর এ নিয়ে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমরা, কোনো মীমাংসা হয়নি; তবে একটা সুবিধা এই হলো যে আমাদের মুখে-মুখে ওর নাম হয়ে গেল মোনালিসা। অন্তরায় যতই সুর ঝরুক, তরুতে যতই তরুণতা, যে নামে ওকে সবাই ডাকে সেনামে তো আমরা ওকে ভাবতে পারি না-অন্য একটি নাম, যা শুধু আমরা জানি, আর কেউ জানে না, এমন একটি নাম পেয়ে আমরা যেন ওকেই পেলাম।

হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবেই-একই তো বাড়ি, আর হিতাংশুও একটু লাল হয়ে বলত, যাহ! যার মানে হচ্ছে সেটা হলেও হতে পারে-আর তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলতে আমাদের, কিন্তু মনে মনে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এসব কিছু না, শুধুই কথার কথা।

একদিন সন্ধ্যার একটু পরে তিনজনে ফিরছি সাইকেলে রমনা বেড়িয়ে, আমি হিতাংশুর পিছনে, নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু কথা বন্ধ করে সাইকেলের উপর কী রকম কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম সাইকেল থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর জামার গলা; 'উহ' বলে সে নেমে পড়ল, আমিও পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় কে একজন বলে উঠলেন, ঞথরপ ধথড়প,ীসৎষব শথষ! তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে আর তার স্ত্রী-আর কন্যা। অসিত সাইকেলটা একটু ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ করে আছে, তার মুখের ভাবটা বেশ বীরের মতো।

জপথললীীসৎ শৎঢ়য়-বলতে বলতে দে-সাহেব হিতাংশুর মুখের উপর চোখ রাখলেন। Oh, its you! কেশব বাবুর ছেলে!

আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আর এরা-তিনজনকে এক সঙ্গেই তো দেখতে পাই সব সময়। বন্ধু বুঝি? বেশ, বেশ। ও লমরপীসৎষব শথষ, এস একদিন আমাদের ওখানে তোমরা। ওরা চলে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। একটু পরে অসিত বলল, কী কাণ্ড! হিতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে না?

না তো! ঘাবড়াব কেন? ব্রেকটা হঠাৎ-

কোনোদিন তো এরকম হয় না। আর আজ কিনা ওদের সামনে-

বেশ তো! হয়েছে কী? কারো গায়েও পড়েনি, পড়েও যাইনি, হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে-

না, না, তুমি তো ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আর বিকাশ তো-

আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, চুপ কর, ভালো লাগে না!

ও বোধহয় একটু হেসেছিল, অসিত তবু ছাড়ল না। [ও বলতে কাকে বোঝায় তা বোধহয় না বল্লেও চলে।]

হেসেছিল তো বয়ে গেল! চিৎকার করল

হিতাংশু, কিন্তু সে চিৎকার যেন কাণ্না।

তুমি দেখেছিলে বিকাশ? ঠিক মোনালিসার

হাসির মতো কি?

যা বোঝ না তা নিয়ে ঠাট্টা কর না!

বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল। সে রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম, না, দুদিন আধমরা হয়ে রইলাম, সাতদিন মন মরা।

রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বলতে লাগল, চল না একদিন যাই আমরা ওদের ওখানে।

পাগল।

পাগল কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে! বললেন না?

ক্রমে ক্রমে হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জণ্মাল যে দে-সাহেব সত্যিই আমাদের যেতে বলেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো সুখী হবেন তিনি, না গেলে দুঃখিত হবেন-এমনকি তাকে অসম্মানই করা হবে তাতে। তার সম্মান রক্ষার জন্য ক্রমশই আমরা বেশি রকম ব্যস্ত হতে লাগলাম। রোজ সকালে স্থির করি, আজ রোক বিকেলে মনে করি, আজ থাক। কোনোদিন দেখি ওরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ারে, কোনোদিন বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো, তার মানে শহরের একমাত্র ব্যারিস্টার দাস-সাহেব বেড়াতে এসেছেন। আর কোনোদিন বা চুপচাপ দেখে ধরে নিই ওরা বাড়ি নেই। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোঢ়ে পদে দে-সাহেব একা বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, মনে হয় এইটে ভারি সুসময়, কিন্তু বাগানের গেটের সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের যতটা নয় ততটা হিতাংশুর ততটা নয় যতটা আমার, একটু ঠেলাঠেলি ফিশফিশানি হয়, আর শেষ পর্যন্ত তারা-কুটির ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে আমরা অন্যদিকে চলে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখনই ভাবি-বিরক্ত কেন, আর এ নিয়ে এত ভাববারই বা কী আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা করে না? আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই, যাব, বসব, আলাপ করব, চলে আসব-ব্যস!

সেদিন আকশে মেঘ টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরে থেকে মনে হলো ওরা বাড়িতেই আছেন। ছোট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুকল অসিত, লম্বা, ফরসা, সুশ্রী; তারপর হিতাংশু, গম্ভীর, চশমা পরা, ভদ্রলোক

মাফিক; আর সকলের শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমরা, কাউকে ডাকব কিনা, কাকে ডাকব, কী বলে ডাকব এইসব আমরা যতক্ষণ ধরে ভাবছি ততক্ষণ পরদা ঠেলে দে-সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধরে বললেন ণপঢ়?

এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হল। আমি-আমরা-মানে আমরা এসেছিলাম-আপনি বলেছিলেন-আবছা আলোয় তখন দে-সাহেব আমাদের চিনলেন। ও, তোমরা! তা...

অসিত আবার বলল, আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।

ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ...একটু কেশে-এস, এস তোমরা, পরদা তুলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।

যাও, ভিতরে যাও।

ঢুকতে গিয়ে হিতাংশু তার নিজেরই বাড়ির চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিল, খুব লাগল আমার, কিন্তু চুপ করে থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কী। আমাদের কাদামাখা স্যাণ্ডেলে ঝকঝকে মেঝে নোংরা করে এলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখিনি। পেট্রোম্যাক্স জগুলছে। সামনের দিকে সোফায় বসে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে বসে আছে আমাদের মোনালিসা, কোলের উপর মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।

দে-সাহেব বললেন সুমি, এই আমাদের পুরানা পল্টনের থ্রি মস্কেটিঅর্স। এটি কেশববাবুর ছেলে, আর এরা...

হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিল, এর নাম অসিত আর এই হচ্ছে বিকাশ।

মিসেস দে মৃদু হেসে মৃদুস্বরে বললেন, তিন বন্ধু বুঝি তোমরা? বেশ রোজই তো দেখি তোমাদের। বস।

একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ বসে পড়লাম তিনজন। মিসেস দে ডাক দিলেন-তরু!

মোনালিসা চোখ তুলল।

এরা আমাদের প্রতিবেশী-আর এই আমার মেয়ে।

মোনালিসা বই রেখে উঠল, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়াল, অল্প হাওয়ায় গাছ যেমন নড়ে, তেমনি করে মাথা নোয়াল একটু, তারপর আবার চেয়ারে বসে বই খুলে চোখ নিচু করল।

আমার মনে হল আমি স্বপ্ন দেখছি।

অসিত কলকাতার ছেলে, আমাদের সকলের চেয়ে খবর রাখে বেশি, চটপট কথা বলতেও পারে; আর হিতাংশু- সেও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তা ছাড়া এই তারা-কুটির তো তাদেরই বাড়ি কথাবার্তা যা একটু তা ওরা দুজনই বলল, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চপু, কী বলব ভেবেও পেলাম না, বলতেও ভরসা হল না, পাছে আমার বাঙাল টান বেরিয়ে পড়ে। মোনালিসাকে দেখার ইচ্ছা ভেতরে ভেতরে পাগল করে দিচ্ছিল আমাকে, কিন্তু কিছুতেই কি একবারও চোখ তুলতে পারলাম।

ইলেকট্রিসিটি না থাকলে জীবন কীরকম, দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাংঘাতিক, রমনার দৃশ্য কত সুন্দর, এসব কথা শেষ হওয়ার পর মিসেস দে বললেন, তোমরা কি কলেজে পড়?

অসিত যথাযথ জবাব দিযে সগর্বে বলল, হিতাংশু পনের টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।

বাহ বেশ, বেশ। আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না। হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তারের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠল, বাবা, কীটস কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন?

দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কেউ বলতে পারো? অসিত ফস করে বলল, বিকাশ নিশ্চয়ই বলতে পারবে-বিকাশ কবিতা লেখে। সত্যি? মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য-আমি অনুভব করলাম-মোনালিসার চোখেও আমার উপর পড়ল। হাত ঘেমে উঠল আমার, কানের ভিতর যেন পিঁ পিঁ আওয়াজ দিচ্ছে।

সব শুদ্ধ কতটুকু সময়? পনের মিনিট? কুড়ি মিনিট? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন, এত ক্লান্ত লাগল, কলেজে চারটে-পাঁচটা লেকচার শুনেও তত লাগে না। মিসেস দে জোর করেই দুটা ছাতা দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত বকবক না করে ও থাকতেও পারে না-বলে উঠল, কী চমৎকার ওরা!

সত্যি! চমৎকার! হিতাংশু সায় দিল সঙ্গে সঙ্গে।

আমি কথা বললাম না, কোনো কথাই ভালো লাগছিল না আমার। একটু পরে অসিত আবার বলল, কিন্তু জুতোগুলো বাইরে ছেড়ে গেলেই পারতাম আমরা! আর হিতাংশু, তুমি আবার আজ হোঁচট খেলে!

কখন?

ঘরে ঢুকতে গিয়ে।

যাহ!

যাহ আবার কী। আর ঘরে ঢুকে নমস্কার করেছিলেন তো মিসেস দে-কে? নিশ্চয়ই! একটু চুপ করে থাকল হিতাংশু, তারপর হঠাৎ বলল, কিন্তু যখন- মোনালিসা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল...

অন্ধকারে আমরা তিন বন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম এবং অন্ধকারেই বোঝা গেল যে তিনজনেরই মুখ ফ্যাকামে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, আর আমরা কিনা জরদগবের মতো বসেই থাকলাম, উঠে দাঁড়ালাম না কিছু বললাম না, কিচ্ছু না। ওরা আমাদের বাঙাল ভাবলেন, কাঠ-বাঙাল, জংলি বর্বর, খাস কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখ রক্ষা করতে পারল না।

কী যে মন খারা হলো, কী আর বলব।

পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরৎ দিতে। চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসাল, তারপর-তারপর মোনালিসাই এল ঘরে, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম, একটু হেসে বললাম, এই ছাতাটা... ও মা! এর জন্য আবার...বসুন...। মনে-মনে এইরকম ভেবে গিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হলো একটু অন্যরকম। চাকর এসে ছাতাটি নিয়ে ভিতরে চলে গেল, আর ফিরে এল না, কেউই কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। না, না। ওই সুন্দর করে সাজানো ঘর, যেখানে শাদা ধবধবে আলোয় দেওয়ালের প্রতিটি কোণ ঝকঝক করে, আর কোণের চেয়ারে বসে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি কোনো এক নীল মলাটের আশ্চর্য বইয়ের পাতা ওল্টায়- সেখানে জায়গা নেই আমাদের। কিন্তু তাতে কী। মোনালিসা-মোনালিসাই। ঝমঝম করে বর্ষা নামল পুরানা পল্টনে, মেঘে ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুরু দুরু দুপুর, নীল জোছনায় ভিজে-ভিজে রাত্রি। পনের দিন ধরে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পর প্রথম যেদিন রোদ উঠল, সেদিন বাইরে এসে দেখি শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারের মোটরগাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।

হিতাংশুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?

না তো।

তবে কি ওদের বাড়িতে-প্রশ্নটা উচ্চারিত না হয়েও ব্যক্ত হলো। পরের দিন হিতাংশু গম্ভীর মুখে বলল, ওদের বাড়িতেই অসুখ।

কার?

ওরই অসুক।

ওর!

সেদিনও বড় ডাক্তারে গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দুবেলাই। আমরা কি একবার যেতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম রাস্তায়, ডাক্তারের গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, দে-সাহেব সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা একবারও যাও তো ভেতরে, উনি একটু কথা বলবেন। সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস দে, এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বলল, আমাদের ডেকেছেন, মাসিমা? কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি মরে গেলেও ও-সব পারি না।

মিসেস দে বললেন, তরুর অসুখ। তার কহুস্বর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল। কী অসুখ?

টাইফয়েড। ওই ভয়ঙ্কর শব্দটা আস্তে উচ্চারণ করে তিনি বললেন, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

অসিত বলে উঠল, কিছু ভাববেন না। আমরা সব করে দেব।

----------www.arshi.org----------